পরশুরামের গল্পে আড্ডা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বাঙলা গল্পে - উপন্যাসে আড্ডার কথা প্রায়ই আসে। সমাজতাত্ত্বিকরাও আজকাল বাঙালি জীবনের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।১ ছাপোষা লোকজন আড্ডা মারেন, বিদগ্ধ মনীষীরা তাঁদের উপযুক্ত আড্ডায় মাঝে মাঝে জমায়েত হন,বেকার ছেলেরাও রকে বসে আড্ডা মেরে সময় কাটায়। সব আড্ডার প্রসঙ্গ এখানে তুলছি না। পরশুরামের গল্পে যে ক'টি আড্ডা এসেছে শুধু সেইগুলো নিয়েই আলোচনা করব। পরশুরাম যে কতখানি সময় - সচেতন ছিলেন, তাঁর আড্ডাগুলোর দিকে তাকালেই তা ধরা পড়ে।

আড্ডা বলতে বোঝায় কোনো বাঁধা জমায়েত; তার কয়েকজন স্থায়ী সদস্য থাকেন, আরও কয়েকজন অনিয়মিতভাবে যাওয়া-আসা করেন। ট্রেনের কামরায় বা পিকনিকের অবকাশে যে অস্থায়ী জমায়েত হয়, সেগুলো আড্ডার তালিকা থেকে বাদ পড়বে -- যদিও একের -ভেতরে-দুই গল্প লেখার উপলক্ষ্য হিসেবে এ ধরণের অস্থায়ী জমায়েতকে পরশুরাম বারকয়েক কাজে লাগিয়েছেন।২

আড্ডা মানেই অন্তত তিন-চার জন লোকের দেখা পাওয়া যাবে। এমন আড্ডা "বিরিঞ্চিবাবা"-র মেসবাড়িতে ছিল। সেখানে মেসের বাসিন্দা ছাড়া অন্য লোকও এসে জুটতেন (নিতাইবাবু, সত্য ইত্যাদি)। কিন্তু এ-আড্ডার সঙ্গে মূল গল্পটির যোগ কম।

একই কথা বলা যায় "চিকিৎসা-সংকট" সম্পর্কে। নন্দবাবুর বৈঠকখানায় বেশ কিছু লোক নিত্য জড়ো হন। কিন্তু "বিরিঞ্চিবাবা"-র মেসের মতোই নন্দবাবুর বাড়ির আড্ডাও আর দ্বিতীয় কোনো গল্পে ফিরে আসে নি। নন্দবাবুর বিয়ের পর সে-আড্ডা ভেঙে গিয়েছিল।

এখানে তাই বেছে নেওয়া হচ্ছে এমন কয়েকটি আড্ডা যেগুলির পটভূমিতে একাধিক গল্প লেখা হয়েছে। অর্থাৎ যে - আড্ডডাগুলোকে কেন্দ্র করে এক-একটি গল্পচত্র তৈরি হয়। প্রথমে তার তালিকা দেওয়া যাক।

বংশলোচনবাবুর আড্ডা লম্বকর্ণ ১৯২৪
দক্ষিণরায় ১৯২৫/২৬
স্বয়ম্বরা ১৯২৭
রাতারাতি ১৯৩০
গুবিদায় ১৯৩০/৩১
মহেশের মহাযাত্রা ১৯৩১
গোপাল মুখুজ্যের আড্ডা সিদ্ধিনাথের প্রলাপ ১৯৫০
তিলোত্তমা ১৯৫৪
কালীবাবুর চা-এর দোকান জটাধর বকশী ১৯৫২
(দিল্লি) জটাধরের বিপদ ১৯৫৪
চাঙ্গায়নী সুধা ১৯৫৬
জ্যোতিষ মিত্রর আড্ডা নিকষিত হেম ১৯৫৩
দ্বান্দ্বিক কবিতা ১৯৫৭
দাঁড়কাগ ১৯৫৯

সাল-তারিখ নজরে রাখলে বোঝা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আড্ডার চরিত্রও বদলেছে।

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় মধ্যমণি হয়ে থাকেন চাটুজ্যেমশায়। তাঁর কাছেই সকলে গল্প শুনতে চান। কিন্তু গল্পই এই আড্ডার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। পরশুরাম জানিয়েছেন "বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় যে সান্ধ্য আড্ডা বসে তাহাতে নিত্য বহুসংখ্যক রাজা-উজির বধ হইয়া থাকে। লাটসাহেব, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, মোহনবাগান, পরমার্থতত্ত্ব, প্রতিবেশী অধর - বুড়োর শ্রাদ্ধ, আলিপুরের নূতন কুমীর কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না। সম্প্রতি সাত দিন ধরিয়া বাঘের বিষয় আলোচিত হইতেছিল। এই সূত্রে গতকালও বংশলোচনের শ্যালক নগেন এবং দূর সম্পর্কের ভাগিনেয় উদয়ের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। অন্যান্য সভ্য অনেক কষ্টে তাহাদিগকে নিরস্ত করেন" ("লম্বকর্ণ")। একে বলা যায় সন্ধে - কাটানোর জন্যে twaddle-এর জায়গা।
এই আড্ডা যাঁর বাড়িতে বসে তিনি স্বচ্ছল মানুষ, "জমিনদার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বেলেঘাটা বেঞ্চ"। বংশলোচনবাবুনিজেও তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন বিস্তর একজন মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বেলেঘাটা রোডে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিস্তর ভূসম্পত্তি। তিনি একজন খেতাবধারী অনারারি হাকিম, --পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, এক মাস পর্যন্ত জেল দিতে পারেন।" তাঁর আড্ডার স্থায়ী সভ্যরা কেউই, মোসায়েব নন, যেমন ছিল নন্দবাবুর আড্ডার নিধু। নগেন আর উদয়কে পাত্তা না-দিলেও চাটুজ্যেমশায় ও বিনোদ উকিল সম্পর্কে বংশোলচনবাবু বেশ শ্রদ্ধাবান।৩ অর্থাৎ বংশলোচনবাবু নাকউঁচু মানুষ নন। তবে তাঁর মুবিব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর স্ত্রী মানিনী দেবী ছাড়া আর কাউকেই তিনি রেয়াত করেন না। মানিনী দেবী যে পিকেটিং করার বা প্রভাতফেরি গাওয়ার ঝোঁক দেখান নি, শুধু মন্তর নিতে চেয়েছেন -- এতেই বংশলোচনবাবু আশ্বস্ত। ১৯২৪ থেকে ১৯৩১ -এর মধ্যে লেখা এই গল্পচত্রে এক বিশেষ সময় ও তার চরিত্ররা ধরা পড়েছে।৪

গোপাল মুখুজ্যের আড্ডা নিয়ে গল্প মাত্র দুটি। দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন উঠে গেছে, রাজদ্রোহর ভয় আর নেই। কিন্তু স্বাধীনভারতের হালচাল দেখে পরশুরাম বিশেষ ভরসা পান না। তাই সিদ্ধিনাথ নামে একটি খ্যাপা চরিত্র আমদানি করে তিনি প্রথমে একটি থিসিস-মার্কা গল্প লেখেন। এ আড্ডার চরিত্র নেহাতই পারিবারিক; গোপাল মুখেজ্যে বেশ পসারওয়ালা উকিল, তাঁর বাল্যবন্ধু সিদ্ধিনাথ, গোপালবাবুর শালী অসিতা আর তাঁর বর, রমেশ ডাক্তার। স্ত্রী-পুষের এ রকম মিশ্র আড্ডা ১৯২০-র দশকে ছিল না, কিন্তু ১৯৫০-এর দশকে থাকা অসম্ভব নয়।৫ তবে সিদ্ধিনাথের বউ সম্পর্কে পরশুরাম বলে দেন "নবদুর্গা একটু সেকেলে, এই মেয়ে-পুষের আড্ডায় তিনি আসেন না।"
এ আড্ডার মধ্যমণি হলেন সিদ্ধিনাথ। তাঁর পরিচয় দিয়ে প্রথমে বলা হয়েছিল "পূর্বে সরকারী কলেজে প্রফেসারি করতেন, বিদ্যার খ্যাতিও ছিল, কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় চাকুরি গেছে এখন আগের চাইতে অনেক ভাল আছেন। কিন্তু মাথার গোলমাল সম্পূর্ণ দূর হয় নি। সামান্য পেনশনে এবং বাড়িতে দু-চারটি ছাত্র পড়িয়ে কোনও রকমে সংসার চালান।" পরের গল্পে দেখা যায় ইতোমধ্যে তিন বছর কেটে গেছে, সিদ্ধিনাথবাবু "এখন ভাল আছেন, শিবচন্দ্র কলেজে পড়াচ্ছেন। সম্প্রতি কুবুদ্ধির সম্বন্ধে থিসিস লিখে পিএচ. ডি. ডিগ্রী পেয়েছেন।"৬ অসিতা যে সিদ্ধিনাথের ভূতপূর্ব ছাত্রী সে কথা আগে বলা হয় নি, এই গল্পেই প্রথম বলা হলো।
"সিদ্ধিনাথের প্রলাপ" পরশুরামের না-হাসির গল্প পর্যায়েই পড়ে। এর মধ্যে যেটুকু রসিকতা আছে তা-ও কষা বা ব্ল্যাক হিউমার। "তিলোত্তমা" সে তুলনায় অনেক নির্মল হাসির গল্প। চাটুজ্যেমশায়ের মতো সিদ্ধিনাথকেও প্রেমের গল্প বলতে ফরমাশ করা হয়। সিদ্ধিনাথও নিজের ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথা ফাঁদেন। নমিতা অবশ্য সেটিকে "আগাগোড়া মিথ্যে' বলে উড়িয়ে দেন।
"নূতন দিল্লির গোল মার্কেটের পিছনে কুচা চমৌকিরাম নামে একটি গলি আছে। এই গলির মোড়েই কালীবাবুর বিখ্যাত দোকান ক্যালকাটা টি ক্যাবিন। এখানে চা বিস্কুট সস্তা কেক সিগারেট চুট আর বাংলা পান পাওয়া যায় তামাকের ব্যবস্থা আর গোটাকত হুঁকোও আছে। দু-এক মাইলের মধ্যে যেসব অল্পবিত্ত বাঙালী বাস করেন তাঁদের অনেকে কালীবাবুর দোকানে চা খেতে আসেন। সন্ধ্যার সময় খুব লোকসমাগম হয় এবং জাঁকিয়ে আড্ডা বসে।"৭

"জটাধর বকশী"-র গোড়াতেই এইভাবে একটি নতুন আড্ডার সূত্রপাত হয়। আগের সব আড্ডা থেকে এ আড্ডার চরিত্র আলাদা। কার বাড়িতে এ আড্ডা বসে না, বসে চা-এর দোকানে।। 'সস্তা কেক' দিয়ে যার আভাস দেওয়া হয়েছিল 'অল্পবিত্ত বাঙালী'দিয়ে তার গোত্রপরিচয় আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। যে তিনজনের নাম জানা যায় -- রামরতন মুখুজ্যে, স্কুল মাস্টার কপিল গুপ্ত, আর বীরেশ্বের সিংগি -- তিনজনেই ছাপোষা লোক। এঁরা কেউই ভেতরের গল্পর বক্তা নন, সকলেই শ্রোতা। বক্তা জটাধর বকশী একজন পাতি ঠক। বারবার তিনবার ঐ আড্ডার লোকদের, মায় চা-এর দোকানের মালিককেও, ঠকিয়ে দশ - বিশ টাকা হাতিয়ে তিনি চলে যান। অর্থাৎ এই আড্ডায় যিনি গল্প বলেন তিনি ঐ আড্ডার স্থায়ী সদস্যও নন, মাঝে মধ্যে তাঁর আবির্ভাব হয়। এমনই তাঁর গল্প বলার কায়দা যে আড্ডাধারীরা ঠকলেও দুঃখ পান না।

বাঙালির গোষ্ঠী মনোভাব আর চা-র দোকানের নামকরণে ছেড়ে-আসা কলকাতা নিয়ে স্মৃতিকাতরতা -- এগুলোও নিশ্চয়ই নজর কাড়ার মতো।

জ্যোতিষ মিত্রর আড্ডা বসে কলকাতায়, কিন্তু বংশলোচনবাবুর বাড়ি আড্ডার চেয়ে আরও গণতান্ত্রিক। জ্যোতিষবাবু জামিনদার নন, বা নন্দর মতো অনর্জিত আয়ের উত্তরাধিকারীও নন। তিনি "একজন মস্ত সাহিত্যিক", খুব পড়াশুনোও করেছেন। এই আড্ডার নিয়মিত সভ্যরা নিজেদের মধ্যে বিস্তর তর্কাতর্কি করেন। চাটুজ্যে মশায়ের মতো এখানেও হাজির আছেন এক সবজান্তা, পিনাকী সর্বজ্ঞ।৮ এছাড়া আছেন উপেন দত্ত আর ললিত সাঙ্গেল; অনিয়মিত সদস্য হিসেবে মাঝে মাঝে দেখা দেন কোন্নগরের ভূপতি মুখুজ্যে আর জ্যোতিষবাবুর বন্ধু, কাঞ্চন মজুমদার। পিনাকী সর্বজ্ঞ আর উপেন দত্তের মধ্যে প্রায়ই খটাখটি লাগে। এঁদের পেছনে চাটুজ্যেমশায় আর বিনোদ উকিলের ছায়া পড়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু সেটা ছায়াই বিনোদ উকিল কখনোই চাটুজ্যে মশায়ের সহেগ কথায় কথায় তর্ক জুড়তেন না, তবে মাঝে মাঝে বেয়াড়া প্রশ্ন তুলতেন।

জ্যোতিষ মিত্রর গল্পচত্রর বৈশিষ্ট্য হলো এখানে ভেতরের গল্পর কোনো নির্দিষ্ট বক্তা নেই। "নিকষিত হেম" --এর ভেতরের গল্পটি বলেন জ্যোতিষ মিত্র নিজে; "দ্বান্দ্বিক কবিতা"-য় গল্পদুটির কথক ভূপতি মুখুজ্যে। দুজনের গল্প বলার ধরণও দুরকমের। প্রথমজন কোনো ভাঁড়ামির মধ্যে যান না, দ্বিতীয়জন 'সেকেলে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার ভঙ্গীতে সুর করে হাত নেড়ে' ছড়া কাটেন। আশা করা গিয়েছিল পিনাকী সর্বজ্ঞ" নিজে অন্তত একটি গল্প বলবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে পরশুরাম পাঠকদের নিরাশ করেছেন। গল্পের গোড়ায়, মাঝে বা শেষে নানা ধরণের মন্তব্য করলেনও, গল্প ভেতরে তিনি কোনো গল্প বলেন নি। "দাঁড়কাগ" একটানা একটি গল্প; আড্ডার চরিত্রদের ছুঁয়ে সেটি চলে যায় কাঞ্চন মজুমদারের বিয়ে করতে চাওয়া ও না - পারারা গল্পে। জ্যোতিষ মিত্রর আড্ডা এখানে উপলক্ষ্য মাত্র। বংশলোচনবাবুর আড্ডায় "গুবিদায়" ও "রাতারাতি" গল্পদুটি ছিল এই ধাঁচের।

আগেই বলেছি, পরশুরামের অন্যান্য গল্পেও এমন নিয়মিত বা অনিয়মিত সদস্যদের নিয়ে আড্ডার কথা আছে। রাজনৈতিকগল্প লিখতে বসে তিনি প্রেতচত্র। ("রামরাজ্য"), পার্ক-এর আড্ডা ("শোনা কথা") ইত্যাদি কাজে লাগিয়েছেন কিন্তু এইসব আড্ডা দ্বিতীয়বার ফিরে আসে নি। গোড়ার দিকে গল্পের আড্ডার সদস্যদের চেহারা বা স্বভাব-চরিত্রর বিস্তৃত বিবরণ থাকত না, তবে কয়েকজনের ছবি থেকে তাঁদের সম্পর্কে ধারণা করা যেত।৯ শেষের দিকের কয়েকটি গল্পে (যেমন, "দীনেশের ভাগ্য" ও "শোনা কথা") তেমন বিবরণ এসেছে। কিন্তু চারটি গল্পচত্রর কোনোটিতে আড্ডার সদস্যদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নেই।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি আড্ডার ধরণাধারণ কেমন পাল্টেছে তা বোঝার পক্ষে পরশুরামের ঐ চারটি গল্পচত্রই চমৎকার দৃষ্টান্ত। এইসব আড্ডার সঙ্গে পার্শীবাগানের আড্ডার মিল খুঁজে লাভ নেই।১০ পরশুরামের গল্পর আড্ডার সদস্যসংখ্যা অল্প, কখনোই ছয়ের বেশি নয়। আর ১৪, পার্শীবাগান লেনে সর্বক্ষণই প্রায় নরক গুলজার হতো; বসত তাস, পাশা, দাবার আসর। পরশুরামের গল্পর আড্ডায় ওসবের বালাই নেই। বংশলোচনবাবুর আড্ডা যে ১৯৫০-এর দশকে অচল হয়ে পড়েছে তা-ও বোঝা যায় জ্যোতিষ মিত্রর আড্ডার গণতান্ত্রিক চরিত্র থেকে। যদি বা সে-আড্ডা মেঝেয় ফরাস বিছিয়ে বা তক্তাপোশের ওপর বসে, সেখানে আর হেলান দেওয়ার মতো তাকিয়া থাকে না -- অন্তত গল্পে তার উল্লেখ নেই।

আরও একটি বিষয় খেয়াল করা দরকার। আড্ডা নিয়ে গল্পগুলোয় সবক্ষেত্রে গল্পর - ভেতরে - গল্প থাকে না। বংশলোচনবাবুর আড্ডায় গল্পর - ভেতরে - গল্প এসেছে তিনটিতে (''দক্ষিণরায়'', ''স্বয়ম্বরা', আর ''মহেশের মহাযাত্রা'')। গোপাল মুখুজ্যের আড্ডায় একটিতে (''তিলোত্তমা''), কালীবাবুর চা-এর দোকানে দুটিতে (''জটাধর বক্শী'' আর ''চাঙ্গানী সুধা'') আর জ্যোতিষ মিত্রর আড্ডার দুটিতে (''নিকষিত হেম'' ও ''দ্বান্দ্বিক কবিতা'')। এছাড়া কোনো গল্পচত্রর প্রথম গল্প থেকে আন্দাজ করা যায় না এর থেকে একটি গল্পচত্রর সূচনা হবে। একই গল্পচত্রর দুটি গল্পর মধ্যে কয়েক বছরের ব্যবধান থাকে। তবু সব মিলিয়ে অতিরঞ্জিত (কিন্তু পুরোপুরি অবাস্তব নয়) ও মজাদার অলৌকিক গল্প বলার বাহন হিসেবে এই গল্পচত্রগুলি পরশুরামের কাজে লেগেছে। এ দিক থেকেও আড্ডা -বাছাই -এ তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ।

।। টীকা।।

১. দীপেশ চত্রবর্তী (২০০১), অধ্যায় ৭দ্র.। দীপেশবাবুর আলোচনায় আড্ডা নিয়ে অনেকের লেখার কথা এসেছে, কিন্তু গোপাল হালদারের 'আড্ডা' (১৯৫৩)-র নাম পর্যন্ত নেই। 'সবুজ পত্র'-র পরিশীলিত আড্ডার এক মনোরম বিবরণ আছে হারীতকৃষ্ণ দেবের ''টী-পার্টি'' -তে। সংলাপ আকারে আড্ডার ওপর এই লেখাটি প্রথম বেরিয়েছিল 'সবুজ পত্র', মার্চ ১৯১৭-য়। 'সবুজপাতার ডাক'-এসেটি আবার ছাপা হয়েছে (১১৮-১২৪)। দীপেশবাবু এই মূল্যবান দলিলটি দেখেন নি।

আর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ''বরযাত্রী'' ইত্যাদি গল্পে যেসব ছেলে - ছোকরার দেখা পাওয়া যায় -- গণশা, গোরচাঁদ, ঘোতনা, তিলু, আর কে. গুপ্ত -- তারা কেউ দার্জিলিং থেকে চা কিনে আনে না, তাদের কেউ শিকাগো - ফেরত হোমিওপ্যাথির ডাক্তার বা ব্যারিস্টার নয়। তাঁদের কথাবার্তার ধরণ ও আলাপের বিষয়ও 'সবুজ পত্র'-র আড্ডা বা প্রমথ চৌধুরীর গল্পর আড্ডা থেকে পুরোপুরি আলাদা।

২. পরশুরামের প্রায় সব একের - ভেতরে -দুই গল্পই আমি-র বয়ানে বা 'সে'/ 'তিনি' -র আঙ্গিকে -- কোনো - না - কোনো জমায়েতের খেই ধরে লেখা।

৩. বংশলোচনবাবুর এডিটরিঅল/ সেন্সরিআল রোল অফ দ পেট্রন' বিষয়ে দীপেশবাবু যা লিখেছেন (১৯৩) তা ঠিক হতে পারেনা। তাতে অতিব্যাখ্যার লক্ষণ স্পষ্ট। যে - কোনো বিপদে আপদে বংশলোচনবাবু সর্বদাই 'বিচক্ষণ চাটুজ্যে মহাশয় আর তীক্ষ্নবুদ্ধি বিনোদ উকিল'' -এর ভরসা করেন (''লম্বকর্ণ'')। আর যে - প্রসঙ্গে বংশলোচনবাবুর ততাকথিত 'এডিটরিআল/ সেনসরিআল রোল'' দীপেশবাবুর চোখে পড়েছে সেটিও চূড়ান্ত হাস্যকর। আসলে বংশলোচনবাবু সায়েবভক্ত লোক, তাঁর বৈঠকখানায় কোনো রাজদ্রোহমূলক গল্প হোক তা তিনি চান না। কিন্তু গল্পর টানও কিছু কম নয়। বিনোদ উকিল যখন চাটুজ্যে মশায়কে বলেন, ''চলুন আমার বাসায় সেখানে হাকিম নেই'', তখন বংশলোচনবাবুই তাতে বাধা দেন ''আরে না না। এখানেই হ'ক। তবে চাটুজ্যেমশায় বেশী সিডিশস কথাগুলো বাদ দিয়ে বলবেন।'' তার মানে, অল্প - অল্প সিডিশস কথায় বংশলোচনবাবুর আপত্তি নেই। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে চাটুজ্যেমশায় বলেন ''মা ভৈঃ। আমি খুব বাদ সাদ দিয়েই বলছি।

তবে ভেতরের গল্পে রামগিধর যখন বকুবাবুকে জানান, ''গবরমেন্টের মাংসও বাবা খেয়ে থাকেন- ''ওকি চাটুজ্যে মশায়।'' এখানে ভীতু মানুষটিকে চেনা যায়। চাটুজ্যে মশায়ও বোঝেন অনারারি হাকিমের এতটা সহ্য হবে না। তিন আবার ভরসা দেন ''হাঁ হাঁ মনে আছে। আচ্ছা, খুব ইশারায় বলছি।''

এর মধ্যে 'এডিটরিআল/ সেনসরিআল রোল' কোথায়? বরং বংশলোচনবাবু যথেষ্ট বিনয়ী লোক। কোনো হামবড়া ভাব তাঁর নেই। প্রমথ চৌধুরীর ফরমায়েসি গল্পর জমিদারবাবুর মতো তিনি হুকুম জারি করেন না।

৪. এ বিষয়ে অনাত্রআলোচনা করেছি। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ২০০৬ দ্র.